হ য ব র ল

সুকুমার রায়

http://www.iopb.res.in/~somen

বেজায় গরম। গাছতলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির।

ঘাসের উপর রুমালটা ছিল, ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি অমনি রুমালটা বলল, "ম্যাও!" কি আপদ! রুমালটা ম্যাও করে কেন?

চেয়ে দেখি রুমালটা তো আর রুমাল নেই, দিব্যি মোটা-সোটা লাল টক্‌টকে একটা বেড়াল গোঁফ ফুলিয়ে প্যাটপ্যাট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে!

আমি বললাম, "কি মুশকিল! ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।"

অমনি বেড়ালটা বলে উঠল, "মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।"

আমি খানিক ভেবে বললাম, "তা হলে তোমায় এখন কি বলে ডাকব? তুমি তো সত্যিকারের বেড়াল নও, আসলে তুমি হচ্ছ রুমাল।"

বেড়াল বলল, "বেড়ালও বলতে পার, রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।" আমি বললাম, "চন্দ্রবিন্দু কেন?"

শুনে বেড়ালটা "তাও জানো না?" বলে এক চোখ বুজে ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করে বিশ্রীরকম হাসতে লাগল। আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মনে হল, ঐ চন্দ্রবিন্দুর কথাটা নিশ্চয় আমার বোঝা উচিত ছিল। তাই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, "ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।"

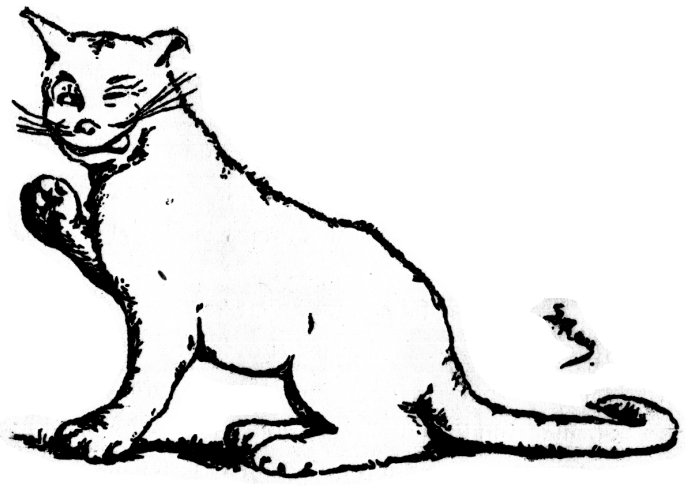

বেড়ালটা খুশি হয়ে বলল, "হ্যাঁ, এ তো বোঝাই যাচ্ছে – চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা – হল চশমা। কেমন, হল তো?"

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পাছে বেড়ালটা আবার সেইরকম বিশ্রী করে হেসে ওঠে, তাই সঙ্গে সঙ্গে হুঁ-হুঁ করে গেলাম। তার পর বেড়ালটা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পার।"

আমি বললাম, "বলা ভারি সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না?"

বেড়াল বলল, "কেন? সে আর মুশকিল কি?"

আমি বললাম, "কি করে যেতে হয় তুমি জানো?"

বেড়াল এক গাল হেসে বলল, "তা আর জানি নে? কলকেতা, ডায়মণ্ডহারবার, রানাঘাট, তিব্বত, ব্যাস্। সিধে রাস্তা, সওয়া ঘণ্টার পথ, গেলেই হল।"

আমি বললাম, "তা হলে রাস্তাটা আমায় বাতলে দিতে পার?"

শুনে বেড়ালটা হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু, সে আমার কর্ম নয়। আমার গেছোদাদা যদি থাকত, তা হলে সে ঠিক-ঠিক বলতে পারত।"

আমি বললাম, "গেছোদাদা কে? তিনি থাকেন কোথায়?"

বেড়াল বলল, "গেছোদাদা আবার কোথায় থাকবে? গাছে থাকে।"

আমি বললাম, "কোথায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়?"

বেড়াল খুব জোরে মাথা নেড়ে বলল, "সেটি হচ্ছে না, সে হবার জো নেই।"

আমি বললাম, "কিরকম?"

বেড়াল বলল, "সে কিরকম জানো? মনে কর, তুমি যখন যাবে উলুবেড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তখন তিনি থাকবেন মতিহারি। যদি মতিহারি যাও, তা হলে শুনবে তিনি আছেন রামকিষ্টপুর। আবার সেখানে গেলে দেখবে তিনি গেছেন কাশিমবাজার। কিছুতেই দেখা হবার জো নেই।"

আমি বললাম, "তা হলে তোমরা কি করে দেখা কর?"

বেড়াল বলল, "সে অনেক হাঙ্গামা। আগে হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় নেই; তার পর হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় থাকতে পারে; তার পর দেখতে হবে দাদা এখন কোথায় আছে। তার পর দেখতে হবে, সেই হিসেব মতো যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছাবে, তখন

দাদা কোথায় থাকবে। তার পর দেখতে হবে —”

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, “সে কিরকম হিসেব?”

বেড়াল বলল, “সে ভারি শক্ত। দেখবে কিরকম?” এই বলে সে একটা কাঠি দিয়ে ঘাসের উপর লম্বা আঁচড় কেটে বলল, “এই মনে কর গেছোদাদা।” বলেই খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে রইল।

তারপর আবার ঠিক তেমনি একটা আঁচড় কেটে বলল, “এই মনে কর তুমি,” বলে আবার ঘাড় বাঁকিয়ে চুপ করে রইল।

তারপর হঠাৎ আবার একটা আঁচড় কেটে বলল, “এই মনে কর চন্দ্রবিন্দু।” এমনি করে খানিকক্ষণ কি ভাবে আর একটা করে লম্বা আঁচর কাটে, আর বলে, “এই মনে কর তিব্বত—”, “এই মনে কর গেছোবৌদি রান্না করছে—” “এই মনে কর গাছের গায়ে একটা ফুটো—”

এইরকম শুনতে শুনতে শেষটায় আমার কেমন রাগ ধরে গেল। আমি বললাম, “দূর ছাই। কি সব আবোল তাবোল বকছে, একটুও ভালো লাগে না।”

বেড়াল বলল, “আচ্ছা তাহলে আর একটু সহজ করে বলছি। চোখ বোজ, আমি যা বলব, মনে মনে তার হিসেব কর।” আমি চোখ বুজলাম।

চোখ বুজেই আছি, বুজেই আছি, বেড়ালের আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল, চোখ চেয়ে দেখি বেড়ালটা ল্যাজ খাড়া করে বাগানের বেড়া টপকিয়ে পালাচ্ছে আর ক্রমাগত ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করে হাসছে।

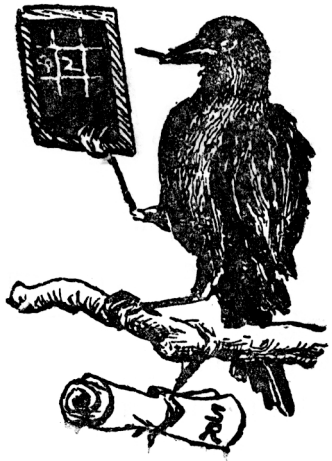

কি আর করি, গাছতলায় একটা পাথরের উপর বসে পড়লাম। বসতেই কে যেন ভাঙা-ভাঙা মোটা গলায় বলে উঠল, “সাত দুগুণে কত হয়?”

আমি ভাবলাম, এ আবার কে রে? এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় আবার সেই আওয়াজ হল, “কই জবাব দিচ্ছ না যে? সাত দুগুণে কত হয়?” তখন উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা দাঁড়কাক স্লেট পেনসিল দিয়ে কি যেন লিখছে, আর এক-একবার ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমি বললাম, “সাত দুগুণে চোদ্দো।”

কাকটা অমনি দুলে-দুলে মাথা নেড়ে বলল, “হয় নি, হয় নি, ফেল্।”

আমার ভয়ানক রাগ হল। বললাম, "নিশ্চয় হয়েছে। সাত এক্কে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দ, তিন সাতে একুশ।"

কাকটা কিছু জবাব দিল না, খালি পেনসিল মুখে দিয়ে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল। তার পর বলল, "সাত দুগুণে চোদ্দোর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।"

আমি বললাম, "তবে যে বলছিলে সাত দুগুণে চোদ্দো হয় না? এখন কেন?"

কাক বলল, "তুমি যখন বলেছিলে, তখনো পুরো চোদ্দো হয় নি। তখন ছিল তেরো টাকা চোদ্দো আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময় বুঝে ধাঁ করে ১৪ লিখে না ফেলতাম, তা হলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দো টাকা এক আনা নয় পাই।"

আমি বললাম, "এমন আনাড়ি কথা তো কখনো শুনি নি। সাত দুগুণে যদি চোদ্দো হয়, তা সে সব সময়েই চোদ্দো। একঘণ্টা আগে হলেও যা, দশদিন পরে হলেও তাই।"

কাকটা ভারি অবাক হয়ে বলল, "তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি?"

আমি বললাম, "সময়ের দাম কিরকম?"

কাক বলল, "এখানে কদিন থাকতে, তা হলে বুঝতে। আমাদের বাজারে সময় এখন ভয়ানক মাগ্যি, এতটুকু বাজে খরচ করবার জো নেই। এই তো কদিন খেটেখুটে চুরিচামারি করে খানিকটে সময় জমিয়েছিলাম, তাও তোমার সঙ্গে তর্ক করতে অর্ধেক খরচ হয়ে গেল।" বলে সে আবার হিসেব করতে লাগল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম।

এমন সময় হঠাৎ গাছের একটা ফোকর থেকে কি যেন একটা সুড়ুৎ করে পিছলিয়ে মাটিতে নামল। চেয়ে দেখি, দেড় হাত লম্বা এক বুড়ো, তার পা পর্যন্ত সবুজ রঙের দাড়ি, হাতে একটা হুঁকো তাতে কলকে টলকে কিচ্ছু নেই, আর মাথা ভরা টাক। টাকের উপর খড়ি দিয়ে কে যেন কি-সব লিখেছে।

বুড়ো এসেই খুব ব্যস্ত হয়ে হুঁকোতে দু-এক টান দিয়েই জিজ্ঞাসা করল, "কই হিসেবটা হল?"

কাক খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, "এই হল বলে।"

বুড়ো বলল, "কি আশ্চর্য! উনিশ দিন পার হয়ে গেল, এখনো হিসেবটা হয়ে উঠলো না?"

কাক দু-চার মিনিট খুব গম্ভীর হয়ে পেনসিল চুষল তারপর জিজ্ঞাসা করল, "কতদিন বললে?"

বুড়ো বলল, "উনিশ।"

কাক অমনি গলা উঁচিয়ে হেঁকে বলল, "লাগ্ লাগ্ লাগ্ কুড়ি।"

বুড়ো বলল, "একুশ।" কাক বলল, "বাইশ।" বুড়ো বলল, "তেইশ।" ঠিক যেন নিলেম ডাকছে।

ডাকতে ডাকতে কাকটা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি ডাকছ না যে?"

আমি বললাম, "খামকা ডাকতে যাব কেন?"

বুড়ো এতক্ষণ আমায় দেখে নি, হঠাৎ আমার আওয়াজ শুনেই সে বন্‌বন্ করে আটদশ পাক ঘুরে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

তার পর হুঁকোটাকে দূরবীনের মতো করে চোখের সামনে ধরে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর পকেট থেকে কয়েকখানা রঙিন কাঁচ বের করে তাই দিয়ে আমায় বার বার দেখতে লাগল। তার পর কোত্থেকে একটা পুরানো দরজির ফিতে এনে সে আমার মাপ নিতে শুরু করল, আর হাঁকতে লাগল, "খাড়াই ছাব্বিশ ইঞ্চি, হাতা ছাব্বিশ ইঞ্চি, আস্তিন ছাব্বিশ ইঞ্চি, ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি।"

আমি ভয়ানক আপত্তি করে বললাম, "এ হতেই পারে না। বুকের মাপও ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলাও ছাব্বিশ ইঞ্চি? আমি কি শুওর?"

বুড়ো বলল, "বিশ্বাস না হয়, দেখ।"

দেখলাম ফিতের লেখা-টেখা সব উঠে গিয়েছে, খালি ২৬ লেখাটা একটু পড়া যাচ্ছে, তাই বুড়ো যা কিছু মাপে সবই ছাব্বিশ ইঞ্চি হয়ে যায়।

তার পর বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, "ওজন কত?"

আমি বললাম, "জানি না।"

বুড়ো তার দুটো আঙুল দিয়ে আমায় একটুখানি টিপে-টিপে বলল, "আড়াই সের।"

আমি বললাম, "সেকি, পট্‌লার ওজনই তো একুশ সের, সে আমার চাইতে দেড় বছরের ছোটো।"

কাকটা অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "সে তোমাদের হিসেব অন্যরকম।"

বুড়ো বললো, "তাহলে লিখে নাও— ওজন আড়াই সের, বয়েস সাঁইত্রিশ।"

আমি বললাম, "দুৎ ! আমার বয়স হল আট বছর তিন মাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ।"

বুড়ো খানিক্ষণ কি যেন ভেবে জিজ্ঞাসা করল, "বাড়তি না কমতি?"

আমি বললাম, "সে আবার কি?"

বুড়ো বলল, "বলি বয়েসটা এখন বাড়ছে না কমছে?"

আমি বললাম, "বয়েস আবার কমবে কি?"

বুড়ো বলল, "তা নয় তো কেবলই বেড়ে চলবে নাকি? তা হলেই তো গেছি। কোনদিন দেখব বয়েস বাড়তে বাড়তে একেবারে ষাট সত্তর আশি বছর পার হয়ে গেছে। শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কি!"

আমি বললাম, "তা তো হবেই। আশি বছর বয়স হলে মানুষ বুড়ো হবে না?"

বুড়ো বলল, "তোমার যেমন বুদ্ধি! আশি বছর বয়েস হবে কেন? চল্লিশ বছর হলেই আমরা বয়েস ঘুরিয়ে দিই। তখন আর একচল্লিশ বেয়াল্লিশ হয় না– ঊনচল্লিশ, আটত্রিশ, সাঁইত্রিশ করে বয়েস নামতে থাকে। এমনি করে যখন দশ পর্যন্ত নামে তখন আবার বয়েস বাড়তে দেওয়া হয়। আমার বয়েস তো কতো উঠল নামল আবার উঠল, এখন আমার বয়েস হয়েছে তেরো।" শুনে আমার ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল।

কাক বলল, "তোমরা একটু আস্তে আস্তে কথা কও, আমার হিসেবটা চট্‌পট্ সেরে নি।"

বুড়ো অমনি চট্ করে আমার পাশে এসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগল, "একটি চমৎকার গল্প বলব। দাঁড়াও একটু ভেবে নি।" এই বলে তার হুঁকো দিয়ে টেকো মাথা চুলকাতে চুলকাতে চোখ বুজে ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, "হ্যাঁ, মনে হয়েছে, শোনো—

"তার পর এদিকে বড়োমন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলিসুতো খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিচ্ছু জানে না। ওদিকে রাক্ষসটা করেছে কি, ঘুমুতে-ঘুমুতে হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ বলে হুড়্‌মুড়্ করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনি ঢাক ঢোল সানাই কাঁশি লোক লস্কর সেপাই পল্টন হৈ-হৈ রৈ-রৈ মার্-মার্ কাট্-কাট্ – এর মধ্যে হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন, 'পক্ষীরাজ যদি হবে, তা হলে ন্যাজ নেই কেন?' শুনে পাত্র মিত্র ডাক্তার মোক্তার আক্কেল মক্কেল সবাই বললে, 'ভালো কথা। ন্যাজ কি হল?' কেউ তার জবাব দিতে পারে না, সুড়্‌সুড়্ করে পালাতে লাগল।"

এমন সময় কাকটা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বিজ্ঞাপন পেয়েছ? হ্যান্ডবিল?"

আমি বললাম, "কই না, কিসের বিজ্ঞাপন?" বলতেই কাকটা একটা কাগজের বাণ্ডিল থেকে একখানা ছাপানো কাগজ বের করে আমার হাতে দিল, আমি পড়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে–

শ্রীশ্রীভূশণ্ডিকাগায় নমঃ

শ্রীকাক্ষেশ্বর কুচ্‌কুচে

৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি

আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী খুচরা ও পাইকারী সকলপ্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া থাকি। মূল্য এক ইঁষ্টি এক টাকা এক আনা। CHILDREN HALF PRICE অর্থাৎ শিশুদের অর্ধমূল্য। আপনার জুতার মাপ, গায়ের রঙ, কান কট্‌কট্‌ করে কি না, জীবিত কি মৃত, ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিবরণ পাঠাইলেই ফেরত ডাকে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

আমরা সনাতন বায়সবংশীয় দাঁড়িকুলীন, অর্থাৎ দাঁড়কাক। আজকাল নানাশ্রেণীর পাতিকাক, হেঁড়েকাক, রামকাক প্রভৃতি নীচশ্রেণীর কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যাবসা চালাইতেছে। সাবধান! তাহাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।

কাক বলল, “কেমন হয়েছে?”

আমি বললাম, “সবটা তো ভালো করে বোঝা গেল না।”

কাক গম্ভীর হয়ে বলল, “হ্যাঁ, ভারি শক্ত, সকলে বুঝতে পারে না। একবার এক খদ্দের এয়েছিল তার ছিল টেকো মাথা—”

এই কথা বলাতেই বুড়ো মাৎ-মাৎ করে তেড়ে উঠে বলল, “দেখ্‌ ফের যদি টেকো মাথা বলবি তো হুঁকো দিয়ে এক বাড়ি মেরে তোর শ্লেট ফাটিয়ে দেব।”

কাক একটু থতমত খেয়ে কি যেন ভাবল, তার পর বলল, “টেকো নয়, টেপো মাথা, যে মাথা টিপে টিপে টোল খেয়ে গিয়েছে।”

বুড়ো তাতেও ঠাণ্ডা হল না, বসে-বসে গজ্‌-গজ্‌ করতে লাগল। তাই দেখে কাক বলল, “হিসেবটা দেখবে নাকি?”

বুড়ো একটু নরম হয়ে বলল, "হয়ে গেছে? কই দেখি?"

কাক অমনি "এই দেখ" বলে তার শ্লেটখানা ঠকাস্ করে বুড়োর টাকের উপর ফেলে দিল। বুড়ো তৎক্ষণাৎ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আর ছোটো ছেলেদের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে "ও মা, ও পিসি, ও শিবুদা" বলে হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগলো।

কাকটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে, বলল, "লাগল নাকি! ষাট-ষাট।"

বুড়ো অমনি কান্না থামিয়ে বলল, "একষট্টি, বাষট্টি, চৌষট্টি —"

কাক বলল, "পঁয়ষট্টি।"

আমি দেখলাম আবার বুঝি ডাকাডাকি শুরু হয়, তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "কই হিসেবটা তো দেখলে না?"

বুড়ো বলল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই তো! কি হিসেব হল পড় দেখি।"

আমি শ্লেটখানা তুলে দেখলাম ক্ষুদে-ক্ষুদে অক্ষরে লেখা রয়েছে—

"ইয়াদি কির্দ অত্র কাকালতনামা লিখিতং শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে কার্যাঞ্চাগে। ইমারৎ খেসারৎ দলিল দস্তাবেজ। তস্য ওয়ারিশানগণ মালিক দখলিকার সত্ব অত্র নায়েব সেরেস্তায় দস্ত বদস্ত কায়েম মোকররী পত্তনীপাট্টা অথবা কাওলা কবুলিয়ৎ। সত্যতায় কি বিনা সত্যতায় মুনসেফী আদালতে কিম্বা দায়রায় সোপর্দ আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী সাবুদ গয়রহ মোকর্দমা দায়ের কিম্বা আপোস মকমল ডিক্রীজারী নিলাম ইস্তাহার ইত্যাদি সর্বপ্রকার কর্তব্য বিধায়—"

আমার পড়া শেষ না হতেই বুড়ো বলে উঠলো, "এ-সব কি লিখেছ আবোল তাবোল?"

কাক বলল, "ও সব লিখতে হয়। তা না হলে আদালতে হিসেব টিকবে কেন? ঠিক চৌকস-মতো কাজ করতে হলে গোড়ায় এ-সব বলে নিতে হয়।"

বুড়ো বলল, "তা বেশ করেছ, কিন্তু আসল হিসেবটা কি হল তা তো বললে না?"

কাক বলল, "হ্যাঁ, তাও তো বলা হয়েছে। ওহে, শেষ দিকটা পড় তো?"

আমি দেখলাম শেষের দিকে মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—

সাত দুগুণে ১৪, বয়স ২৬ ইঞ্চি, জমা ২-১/২ সের, খরচ ৩৭ বৎসর।

কাক বলল, "দেখেই বোঝা যাচ্ছে অঙ্কটা এল-সি-এম্ও নয়, জি-সি-এম্ও নয়। সুতরাং হয় এটা ত্রৈরাশিকের অঙ্ক, নাহয় ভগ্নাংশ। পরীক্ষা করে দেখলাম আড়াই সেরটা হচ্ছে ভগ্নাংশ। তা হলে

বাকি তিনটে হল ত্রৈরাশিক। এখন আমার জানা দরকার, তোমরা ত্রৈরাশিক চাও, না ভগ্নাংশ চাও?"

বুড়ো বলল, "আচ্ছা দাঁড়াও, তা হলে একবার জিজ্ঞাসা করে নি।" এই বলে সে নিচু হয়ে গাছের গোড়ায় মুখ ঠেকিয়ে ডাকতে লাগল, "ওরে বুধো! বুধো রে!"

খানিক পরে মনে হল কে যেন গাছের ভিতর থেকে রেগে বলে উঠল, "কেন ডাকছিস?"

বুড়ো বলল, "কাক্কেশ্বর কি বলছে শোন্।"

আবার সেইরকম আওয়াজ হল, "কি বলছে?"

বুড়ো বলল, "বলছে, ত্রৈরাশিক না ভগ্নাংশ?"

তেড়ে উত্তর হল, "কাকে বলছে ভগ্নাংশ? তোকে না আমাকে?"

বুড়ো বলল, "তা নয়। বলছে, হিসেবটা ভগ্নাংশ চাস, না ত্রৈরাশিক?"

একটুক্ষণ পরে জবাব শোনা গেল, "আচ্ছা, ত্রৈরাশিক দিতে বল।"

বুড়ো গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ দাড়ি হাতড়াল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "বুধোটার যেমন বুদ্ধি! ত্রৈরাশিক দিতে বলব কেন? ভগ্নাংশটা খারাপ হল কিসে? না হে কাক্কেশ্বর, তুমি ভগ্নাংশই দাও।"

কাক বলল, "তা হলে আড়াই সেরের গোটা সের দুটো বাদ গেলে রইল ভগ্নাংশ আধ সের, তোমার হিসেব হল আধ সের। আধ সের হিসেবের দাম পড়ে— খাঁটি হলে দুটাকা চোদ্দোআনা, আর জল মেশানো থাকলে ছয় পয়সা,"

বুড়ো বলল, "আমি যখন কাঁদছিলাম, তখন তিন ফোঁটা জল হিসেবের মধ্যে পড়েছিল। এই নাও তোমার শ্লেট, আর এই নাও পয়সা ছটা।"

পয়সা পেয়ে কাকের মহাফুর্তি॥! সে "টাক্-ডুমাডুম টাক্-ডুমাডুম" বলে শ্লেট বাজিয়ে নাচতে লাগল।

বুড়ো অমনি আবার তেড়ে উঠল, "ফের টাক-টাক বলছিস? দাঁড়া। ওরে বুধো বুধো রে! শিগ্‌গির আয়। আবার টাক বলছে।" বলতে-না-বলতেই গাছের ফোকর থেকে মস্ত একটা পোঁটলা মতন কি যেন হুড়্‌মুড়্ করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। চেয়ে দেখলাম, একটা বুড়ো একটা প্রকাণ্ড বোঁচকার নীচে চাপা পড়ে ব্যস্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। বুড়োটা দেখতে অবিকল এই হুঁকোওয়ালা বুড়োর মতো। হুঁকোওয়ালা কোথায় তাকে টেনে তুলবে না সে নিজেই পোঁটলার উপর চড়ে বসে, "ওঠ্ বলছি, শিগ্‌গির ওঠ্" বলে ধাঁই-ধাঁই করে তাকে হুঁকো দিয়ে মারতে লাগল।

কাক আমার দিকে চোখ মট্‌কিয়ে বলল, "ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে।

এর বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, এখন ও আর বোঝা ছাড়তে চাইবে কেন? এই নিয়ে রোজ মারামারি হয়।”

এই কথা বলতে-বলতেই চেয়ে দেখি, বুধো তার পোঁটলাসুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই সে পোঁটলা উঁচিয়ে দাঁত কড়মড় করে বলল, “তবে রে ইস্টুপিড্ উধো!” উধোও আস্তিন গুটিয়ে হুঁকো বাগিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল, “তবে রে লক্ষ্মীছাড়া বুধো!”

কাক বলল, “লেগে যা, লেগে যা— নারদ নারদ!”

অমনি ঝটাপট্, খটাখট্, দমাদম্, ধপাধপ্! মুহূর্তের মধ্যে চেয়ে দেখি উধো চিৎপাত শুয়ে হাঁপাচ্ছে, আর বুধো ছট্‌ফট্ করে টাকে হাত বুলাচ্ছে।

বুধো কান্না শুরু করল, “ওরে ভাই উধো রে, তুই এখন কোথায় গেলি রে?”

উধো কাঁদতে লাগল, “ওরে হায় হায়! আমাদের বুধোর কি হল রে!”

তার পর দুজনে উঠে খুব খানিক গলা জড়িয়ে কেঁদে, আর খুব খানিক কোলাকুলি করে দিব্যি খোশমেজাজে গাছের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাই দেখে কাকটাও তার দোকানপাট বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গেল।

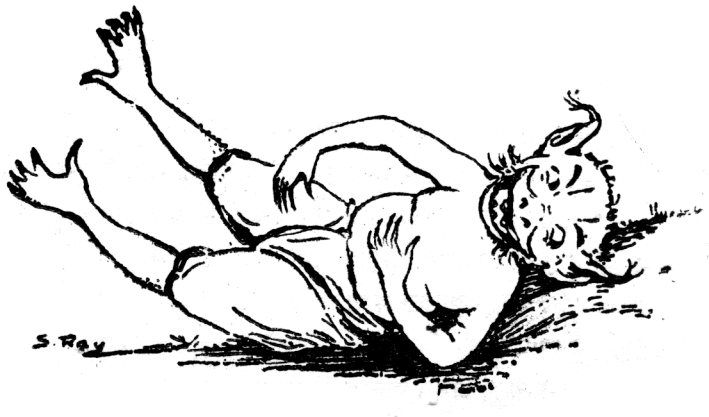

আমি ভাবছি এইবেলা পথ খুঁজে বাড়ি ফেরা যাক, এমন সময় শুনি পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে কিরকম শব্দ হচ্ছে, যেন কেউ হাসতে হাসতে আর কিছুতেই হাসি সামলাতে পারছে না। উঁকি মেরে দেখি, একটা জন্তু— মানুষ না বাঁদর, প্যাঁচা না ভূত, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না— খালি হাত-পা ছুঁড়ে হাসছে, আর বলছে, “এই গেল গেল— নাড়ি-ভুঁড়ি সব ফেটে গেল।”

হঠাৎ আমায় দেখে সে একটু দম পেয়ে উঠে বলল, "ভাগ্যিস তুমি এসে পড়লে, তা না হলে আর একটু হলেই হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাচ্ছিল।"

আমি বললাম, "তুমি এমন সাংঘাতিক রকম হাসছ কেন?"

জন্তুটা বলল, "কেন হাসছি শুনবে? মনে কর, পৃথিবীটা যদি চ্যাপ্টা হত, আর সব জল গড়িয়ে ডাঙায় এসে পড়ত, আর ডাঙার মাটি সব ঘুলিয়ে প্যাচ্‌প্যাচে কাদা হয়ে যেত, আর লোকগুলো সব তার মধ্যে ধপাধপ্ আছাড় খেয়ে পড়ত, তা হলে– হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ -" এই বলে সে আবার হাসতে-হাসতে লুটিয়ে পড়ল।

আমি বললাম, "কি আশ্চর্য। এর জন্য তুমি এত ভয়ানক করে হাসছ?"

সে আবার হাসি থামিয়ে বলল, "না, না, শুধু এরজন্য নয়। মনে কর, একজন লোক আসছে, তার এক হাতে কুলপিবরফ আর-এক হাতে সাজিমাটি, আর লোকটা কুলপি খেতে গিয়ে ভুলে সাজিমাটি খেয়ে ফেলেছে- হোঃ হোঃ, হোঃ হো, হোঃ হোঃ হোঃ হা –" আবার হাসির পালা।

আমি বললাম, "কেন তুমি এই-সব অসম্ভব কথা ভেবে খামকা হেসে-হেসে কষ্ট পাচ্ছ?"

সে বলল, "না, না সব কি আর অসম্ভব? মনে কর, একজন লোক টিকটিকি পোষে, রোজ তাদের নাইয়ে খাইয়ে শুকোতে দেয়, একদিন একটা রামছাগল এসে সব টিকটিকি খেয়ে ফেলেছে— হোঃ হোঃ হোঃ হো –"

জন্তুটার রকম-সকম দেখে আমার ভারি অদ্ভুত লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি কে? তোমার নাম কি?"

সে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, "আমার নাম হিজি বিজ্ বিজ্। আমার নাম হিজি বিজ্ বিজ্, আমার ভায়ের নাম হিজি বিজ্ বিজ্, আমার বাবার নাম হিজি বিজ্ বিজ্, আমার পিসের নাম হিজি বিজ্ বিজ্ —"

আমি বললাম, "তার চেয়ে সোজা বললেই হয় তোমার গুষ্টিসুদ্ধ সবাই হিজি বিজ্ বিজ্।"

সে আবার খানিক ভেবে বলল, "তা তো নয়, আমার নাম তকাই। আমার মামার নাম তকাই, আমার খুড়োর নাম তকাই, আমার মেসোর নাম তকাই, আমার শ্বশুরের নাম তকাই —"

আমি ধমক দিয়ে বললাম, "সত্যি বলছ? না বানিয়ে?"

জন্তুটা কেমন থতমত খেয়ে বলল, "না, না আমার শ্বশুরের নাম বিস্কুট।"

আমার ভয়ানক রাগ হল, তেড়ে বললাম, "একটা কথাও বিশ্বাস করি না।"

অমনি কথা নেই বার্তা নেই, ঝোপের আড়াল থেকে একটা মস্ত দাড়িওয়ালা ছাগল হঠাৎ উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করল, "আমার কথা হচ্ছে বুঝি?"
আমি বলতে যাচ্ছিলাম, "না" কিন্তু কিছু না বলতেই তড়্তড়্ করে সে বলে যেতে লাগল, "তা তোমরা যতই তর্ক কর, এমন অনেক জিনিস আছে যা ছাগলে খায় না। তাই আমি একটা বক্তৃতা দিতে চাই, তার বিষয় হচ্ছে — ছাগলে কি না খায়।" এই বলে সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বক্তৃতা আরম্ভ করল —

"হে বালকবৃন্দ এবং স্নেহের হিজিবিজ্ বিজ্, আমার গলায় ঝোলানো সার্টিফিকেট দেখেই তোমরা বুঝতে পারছ যে আমার নাম শ্রীব্যাকরণ শিং বি. এ. খাদ্যবিশারদ। আমি খুব চমৎকার ব্যা করতে পারি তাই আমার নাম ব্যাকরণ, আর শিং তো দেখতেই পাচ্ছ। ইংরাজিতে লিখবার সময় লিখি B. A. অর্থাৎ ব্যা। কোন-কোন জিনিস খাওয়া যায় আর কোনটা-কোনটা খাওয়া যায় না, তা আমি সব পরীক্ষা করে দেখেছি, তাই আমার উপাধি হচ্ছে খাদ্যবিশারদ। তোমরা যে বল — পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায় – এটা অন্যায়। এই তো একটু আগে ঐ হতভাগা বলছিল যে রামছাগল টিকটিকি খায়। এটা একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি অনেকরকম টিকটিকি চেটে দেখেছি, ওতে খাবার মতো কিচ্ছু নেই। অবশ্যি আমরা মাঝে-মাঝে এমন অনেক জিনিস খাই, যা তোমরা খাও না, যেমন— খাবারের ঠোঙা, কিম্বা নারকোলের ছোবড়া, কিম্বা খবরের কাগজ, কিম্বা সন্দেশের মতো ভালো ভালো মাসিক পত্রিকা। কিন্তু তা বলে মজবুত বাঁধানো কোনো বই আমরা কক্ষনো খাই না। আমরা কচিৎ কখনো লেপ কম্বল কিম্বা তোষক বালিশ এ-সব একটু-আধটু খাই বটে, কিন্তু যারা বলে আমরা খাট পালং কিম্বা টেবিল চেয়ার খাই, তারা ভয়ানক মিথ্যাবাদী। যখন আমাদের মনে খুব তেজ আসে, তখন শখ করে অনেকরকম জিনিস আমরা চিবিয়ে কিম্বা চেখে দেখি, যেমন, পেনসিল, রবার কিম্বা বোতলের ছিপি কিম্বা শুকনো জুতো কিম্বা ক্যামবিসের ব্যাগ। শুনেছি আমার ঠাকুরদাদা একবার ফুর্তির চোটে এক সাহেবের আধখানা তাঁবু প্রায় খেয়ে শেষ করেছিলেন। কিন্তু তা বলে ছুরি কাঁচি কিম্বা শিশি বোতল, এসব আমরা কোনোদিন খাই না। কেউ-কেউ সাবান খেতে ভালোবাসে, কিন্তু সে-সব নেহাত ছোটোখাটো বাজে সাবান। আমার ছোটো ভাই একবার একটা আস্ত বার্-সোপ খেয়ে ফেলেছিল—" বলেই ব্যাকরণ শিং আকাশের দিকে চোখ তুলে ব্যা-ব্যা করে ভয়ানক কাঁদতে লাগল। তাতে বুঝতে পারলাম যে সাবান খেয়ে ভাইটির অকালমৃত্যু হয়েছে।

হিজি বিজ্ বিজ্টা এতক্ষণ পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ ছাগলটার বিকট কান্না শুনে সে হাঁউ-মাঁউ করে ধড়্মড়িয়ে উঠে বিষম-টিষম খেয়ে একেবারে অস্থির। আমি ভাবলাম বোকাটা মরে বুঝি এবার! কিন্তু একটু পরে দেখি, সে আবার তেমনি হাত-পা ছুঁড়ে ফ্যাক্ফ্যাক্ করে হাসতে লাগেছে।

আমি বললাম, "এর মধ্যে আবার হাসবার কি হল?"

সে বলল, "সেই একজন লোক ছিল, সে মাঝে-মাঝে এমন ভয়ংকর নাক ডাকাত যে সবাই তার উপর চটা ছিল। একদিন তাদের বাড়ি বাজ পড়েছে, আর অমনি সবাই দৌড়ে তাকে দমাদম মারতে লেগেছে— হোঃ হোঃ হোঃ হা—" আমি বললাম, "যত-সব বাজে কথা।" এই বলে যেই ফিরতে গেছি, অমনি চেয়ে দেখি একটা নেড়ামাথা কে-যেন যাত্রার জুড়ির মতো চাপকান আর পায়জামা পরে হাসি-হাসি মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে আমার গা জ্বলে গেল। আমায় ফিরতে দেখেই সে আবদার করে আহ্লাদীর মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দুহাত নেড়ে বলতে লাগল, "না ভাই, না ভাই, এখন আমায় গাইতে বোলো না। সত্যি বলছি, আজকে আমার গলা তেমন খুলবে না।"

আমি বললাম, "কি আপদ! কে তোমায় গাইতে বলছে?"

লোকটা এমন বেহায়া, সে তবুও আমার কানের কাছে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করতে লাগল, "রাগ করলে? হ্যাঁ ভাই, রাগ করলে? আচ্ছা, নাহয় কয়েকটা গান শুনিয়ে দিচ্ছি, রাগ করবার দরকার কি ভাই?"

আমি কিছু বলবার আগেই ছাগলটা আর হিজি বিজ্ বিজ্‌টা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, গান হোক, গান হোক।" অমনি নেড়াটা তার পকেট থেকে মস্ত দুই তাড়া গানের কাগজ বার করে, সেগুলো চোখের কাছে নিয়ে গুনগুন করতে করতে হঠাৎ সরু গলায় চীৎকার করে গান ধরল— "লাল গানে নীল সুর, হাসি হাসি গন্ধ।"

ঐ একটিমাত্র পদ সে একবার গাইল, দুইবার গাইল, পাঁচবার, দশবার গাইল।

আমি বললাম, "এ তো ভারি উৎপাত দেখছি, গানের কি আর কোনো পদ নেই?"

নেড়া বলল, "হ্যাঁ আছে, কিন্তু সেটা অন্য গান। সেটা হচ্ছে – অলিগলি চলি রাম, ফুটপাথে ধুমধাম, কালি দিয়ে চুনকাম। সে গান আজকাল আমি গাই না। আরেকটা গান আছে – নাইনিতালের নতুন আলু – সেটা খুব নরম সুরে গাইতে হয়। সেটাও আজকাল গাইতে পারি না। আজকাল যেটা গাই, সেটা হচ্ছে শিখিপাখার গান।" এই বলেই সে গান ধরল—

মিশিপাখা শিখিপাখা আকাশের কানেকানে
শিশি বোতল ছিপিঢাকা সরু সরু গানে গানে
আলাভোলা বাঁকা আলো আধো আধো কতদূরে,
সরু মোটা সাদা কালো ছলছল ছায়াসুরে।

আমি বললাম, "এ আবার গান হল নাকি?" এর তো মাথামুণ্ডু কোনো মানেই হয় না।"

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, "হ্যাঁ গানটা ভারি শক্ত।"

ছাগল বলল, "শক্ত আবার কোথায়? ঐ শিশি বোতলের জায়গাটা একটু শক্ত ঠেকল, তা ছাড়া তো শক্ত কিছু পেলাম না।"

নেড়াটা খুব অভিমান করে বলল, "তা, তোমরা সহজ গান শুনতে চাও তো সে কথা বললেই হয়। অত কথা শোনাবার দরকার কি? আমি কি আর সহজ গান গাইতে পারি না?" এই বলে সে গান ধরল—

বাদুর বলে ওরে ও ভাই সজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।

আমি বললাম, "মজারু বলে কোনো-একটা কথা হয় না।"

নেড়া বলল, "কেন হবে না— আলবৎ হয়। সজারু কাঙ্গারু দেবদারু হতে পারে, মজারু কেন হবে না?"

ছাগল বলল, "ততক্ষণ গানটা চলুক না, হয় কি না হয় পরে দেখা যাবে।" অমনি আবার শুরু হল,

বাদুর বলে ওরে ও ভাই সজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।
আজকে হেথায় চাম্‌চিকে আর পেঁচারা
আসবে সবাই, মরবে ইঁদুর বেচারা।
কাঁপবে ভয়ে ব্যাঙগুলো আর ব্যাঙাচি,
ঘামতে ঘামতে ফুটবে তাদের ঘামাচি,
ছুটবে ছুঁচো লাগবে দাঁতে কপাটি,
দেখবে তখন ছিষ্বি ছ্যাঙা চপাটি।

আমি আবার আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সামলে গেলাম। গান চলল—

সজারু কয় ঝোপের মাঝে এখনি
গিন্নী আমার ঘুম দিয়েছেন দেখ নি?
জেনে রাখুন প্যাঁচা এবং প্যাঁচানি,
ভাঙলে সে ঘুম শুনে তাদের চ্যাঁচানি,
খ্যাংরা-খোঁচা করব তাদের খুঁচিয়ে—
এই কথাটা বলবে তুমি বুঝিয়ে।
বাদুর বলে, পেঁচার কুটুম কুটুমী
মানবে না কেউ তোমার এ-সব ঘুঁতুমি।
ঘুমোয় কি কেউ এমন ভুসো আঁধারে?
গিন্নি তোমার হোঁৎলা এবং হাঁদাড়ে।
তুমিও দাদা হচ্ছ ক্রমে খ্যাপাটে
চিমনি-চাটা ভোঁপসা-মুখো ভ্যাঁপাটে।

গানটা আরো চলত কিনা জানি না, কিন্তু এইপর্যন্ত হতেই একটা গোলমাল শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি আমার আশেপাশে চারদিকে ভিড় জমে গিয়েছে। একটা সজারু এগিয়ে বসে ফোঁৎফোঁৎ করে কাঁদছে আর একটা শামলাপরা কুমির মস্ত একটা বই দিয়ে আস্তে আস্তে তার পিঠ থাবড়াচ্ছে আর ফিস্‌ফিস্ করে বলছে, "কেঁদো না, কোঁদো না, সব ঠিক করে দিচ্ছি।" হঠাৎ একটা তক্‌মা-আঁটা পাগড়ি-বাঁধা কোলাব্যাঙ রুল উঁচিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল — "মানহানির মোকদ্দমা।"

অমনি কোত্থেকে একটা কালো ঝোল্লা-পরা হুতোমপ্যাঁচা এসে সকলের সামনে একটা উঁচু পাথরের উপর বসেই চোখ বুজে ঢুলতে লাগল, আর একটা মস্ত ছুঁচো একটা বিশ্রী নোংরা হাতপাখা দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল।

প্যাঁচা একবার ঘোলা ঘোলা চোখ করে চারদিক তাকিয়েই তক্ষুনি আবার চোখ বুজে বলল, "নালিশ বাতলাও।"

বলতেই কুমিরটা অনেক কষ্টে কাঁদো-কাঁদো মুখ করে চোখের মধ্যে নখ দিয়ে খিমচিয়ে পাঁচ-ছয় ফোঁটা জল বের করে ফেলল। তার পর সর্দিবসা মোটা গলায় বলতে লাগল, "ধর্মাবতার হজুর! এটা মানহানির মকদ্দমা। সতরাং প্রথেমেই বুঝতে হবে মান কাকে বলে। মান মানে কচু। কচু অতি উপাদেয় জিনিস। কচু অনেকপ্রকার, যথা— মানকচু, ওলকচু, কান্দা কচু, মুখিকচু, পানিকচু, শঙ্খকচু, ইত্যাদি। কচুগাছের মূলকে কচু বলে, সুতরাং বিষয়টার একেবারে মূল পর্যন্ত যাওয়া দরকার।"

এইটুকু বলতেই একটা শেয়াল শাম্‌লা মাথায় তড়াক্‌ করে লাফিয়ে উঠে বলল, "হুজুর, কচু অতি অসার জিনিস। কচু খেলে গলা কুট্‌কুট্‌ করে, কচুপোড়া খাও বললে মানুষ চটে যায়। কচু খায় কারা? কচু খায় শুওর আর সজারু। ওয়াক্‌ থুঃ।" সজারুটা আবার ফ্যাঁৎফ্যাঁত্‌ করে কাঁদতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমির সেই প্রকাণ্ড বই দিয়ে তার মাথায় এক থাবড়া মেরে জিজ্ঞাসা করল, "দলিলপত্র সাক্ষী-সাবুদ কিছু আছে?" সজারু নেড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঐ তো ওর হাতে সব দলিল রয়েছে।" বলতেই কুমিরটা নেড়ার কাছ থেকে একতাড়া গানের কাগজ কেড়ে নিয়ে হঠাৎ এক জায়গা থেকে পড়তে লাগল—

একের পিঠে দুই গোলাপ চাঁপা জুঁই সান্‌ বাঁধানো ভুঁই
চৌকি চেপে শুই ইলিশ মাগুর রুই গোবর জলে ধুই
পোঁটলা বেঁধে থুই হিনচে্‌ পালং পুঁই কাঁদিস কেন তুই।

সজারু বলল, "আহা ওটা কেন? ওটা তো নয়।" কুমির বলল, "তাই নাকি? আচ্ছা দাঁড়াও।" এই বলে সে আবার একখানা কাগজ নিয়ে পড়তে লাগল—

চাঁদনিরাতের পেতনীপিসি সজনেতলায় খোঁজ্‌ না রে —
থ্যাঁতলা মাথা হ্যাংলা সেথা হাড় কচাকচ্‌ ভোজ মারে।
চালতা গাছে আল্‌তা পরা নাক ঝুলানো শাঁখচুনি
মাক্‌ড়ি নেড়ে হাঁকড়ে বলে, আমায় তো কেঁউ ডাঁকছ নি!
মুণ্ডু ঝোলা উলটোবুড়ি ঝুলছে দেখ চুল খুলে,
বলছে দুলে, মিনসেগুলোর মাংস খাব তুলতুলে।

সজারু বলল, "দুর ছাই! কি যে পড়ছে তার নেই ঠিক।"

কুমির বলল, "তা হলে কোনটা, এইটা? — দই দম্বল, টোকো অম্বল, কাঁথা কম্বল করে সম্বল বোকা ভোম্বল — এটাও নয়? আচ্ছা তা হলে দাঁড়াও দেখছি — নিঝুম নিশুত রাতে, একা শুয়ে তেতলাতে, খালি খালি খিদে পায় কেন রে? — কি বললে? — ও-সব নয়? তোমার গিন্নির নামে কবিতা?— তা, সে কথা আগে বললেই হত। এই তো— রামভজনের গিন্নীটা, বাপরে যেন সিংহীটা! বাসন নাড়ে ঝনার্‌ঝন, কাপড় কাচে দমাদ্দম্‌। — এটাও মিলছে না?— তা হলে নিশ্চয় এটা—

খুস্‌খুসে কাশি ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, ফুস্‌ফুসে ছ্যাঁদা বুড়ো তুই মর্‌।
মাজ্‌রাতে ব্যথা পাঁজ্‌রাতে বাত, আজ রাতে বুড়ো হবি কুপোকাত।"

সজারুটা ভয়ানক কাঁদতে লাগল, "হায়, হায়। আমার পয়সাগুলো সব জলে গেল! কোথাকার এক আহাম্মক উকিল, দলিল দিলে খুঁজে পায় না।"

নেড়াটা এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে ছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল, "কোনটা শুনতে চাও? সেই যে — বাদুর বলে ওরে ও ভাই সজারু — সেইটে?"

সজারু ব্যস্ত হয়ে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটে, সেইটে।"

অমনি শেয়াল আবার তেড়ে উঠল, "বাদুর কি বলে? হুজুর, তা হলে বাদুরগোপালকে সাক্ষী মানতে আজ্ঞা হোক।"

কোলাব্যাঙ গাল-গলা ফুলিয়ে হেঁকে বলল, "বাদুরগোপাল হাজির?"

সবাই এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, কোথাও বাদুর নেই। তখন শেয়াল বলল, "তা হলে হুজুর, ওদের সক্কলের ফাঁসির হুকুম হোক।"

কুমির বলল, "তা কেন? এখন আমরা আপিল করব?"

প্যাঁচা চোখ বুজে বলল, "আপিল চলুক! সাক্ষী আন।"

কুমির এদিক-ওদিক তাকিয়ে হিজি বিজ্ বিজ্‌কে জিজ্ঞাসা করল, "সাক্ষী দিবি? চার আনা পয়সা পাবি।" পয়সার নামে হিজি বিজ্ বিজ্ তড়াক্ করে সাক্ষী দিতে উঠেই ফ্যাক্‌ফ্যাক্ করে হেসে ফেলল।

শেয়াল বলল, "হাসছ কেন?"

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, "একজনকে শিখিয়ে দিয়েছিল, তুই সাক্ষী দিবি যে, বইটার সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া আর মাথার উপর লালকালির ছাপ। উকিল যেই তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি আসামীকে চেন? অমনি সে বলে উঠেছে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া, মাথার উপর লাল কালির ছাপ - হোঃ হোঃ হোঃ হো—"

শেয়াল জিজ্ঞাসা করল, "তুমি সজারুকে চেন?"

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, "হ্যাঁ, সজারুকে চিনি, কুমির চিনি, সব চিনি। সজারু গর্তে থাকে, তার গায়ে লম্বা-লম্বা কাঁটা, আর কুমিরের গায়ে চাকা-চাকা ঢিপির মতো, তারা ছাগল-টাগল ধরে খায়।" বলতেই বয়াকরণ শিং ব্যা-ব্যা করে ভয়ানক কেঁদে উঠল।

আমি বললাম, "আবার কি হল?"

ছাগল বলল, "আমার সেজোমামার আধখানা কুমিরে খেয়েছিল, তাই বাকি আধখানা মরে গেল।"

আমি বললাম, "গেল তো গেল, আপদ গেল। তুমি এখন চুপ কর।"

শেয়াল জিজ্ঞাসা করল, "তুমি মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু জানো?"

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, "তা আর জানি না? একজন নালিশ করে তার একজন উকিল থাকে, আর একজনকে আসাম থেকে নিয়ে আসে, তাকে আসামী বলে। তারও একজন উকিল থাকে। এক-একদিকে দশজন করে সাক্ষী থাকে। আর একজন জজ থাকে, সে বসে-বসে ঘুমোয়।"

প্যাঁচা বলল, "কক্ষনো আমি ঘুমোচ্ছি না, আমার চোখে ব্যারাম আছে তাই চোখ বুজে আছি।"

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, "আরো অনেক জজ দেখেছি, তাদের সক্কলেরই চোখে ব্যারাম।" বলেই সে ফ্যাক্ফ্যাক্ করে ভয়ানক হাসতে লাগল।

শেয়াল বলল, "আবার কি হল?"

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, "একজনের মাথার ব্যারাম ছিল, সে সব জিনিসের নামকরণ করত। তার জুতোর নাম ছিল অবিমৃষ্যকারিতা, তার ছাতার নাম ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তার গাড়ুর নাম ছিল পরমকল্যাণবরেষু— কিন্তু যেই তার বাড়ির নাম দিয়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়িটাড়ি সব পড়ে গিয়েছে। হোঃ হোঃ হোঃ হো—"

শেয়াল বলল, "বটে তোমার নাম কি শুনি?"

সে বলল, "এখন আমার নাম হিজি বিজ্ বিজ্।"

শেয়াল বলল, "নামের আবার এখন তখন কি?"

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, "তাও জান না? সকালে আমার নাম থাকে আলুনারকোল আবার আর একটু বিকেল হলেই আমার নাম হয়ে যাবে রামতাড়ু।"

শেয়াল বলল, "নিবাস কোথায়?"

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, "কার কথা বলছ? শ্রীনিবাস? শ্রীনিবাস দেশে চলে গিয়েছে।" অমনি ভিড়ের মধ্যে থেকে উধো আর বুধো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "তা হলে শ্রীনিবাস নিশ্চয়ই মরে গিয়েছে।"

উধো বলল, "দেশে গেলেই লোকেরা সব হুস্হুস্ করে মরে যায়।"

বুধো বলল, "হাবুলের কাকা যেই দেশে গেল অমনি শুনি সে মরে গিয়েছে।"

শেয়াল বলল, "আঃ, সবাই মিলে কথা বোলো না, ভারি গোলমাল হয়।"

শুনে উধো বুধোকে বলল, "ফের সবাই মিলে কথা বলবি তো তোকে মারতে মারতে সাবাড় করে ফেলব।" বুধো বলল, "আবার যদি গোলমাল করিস তা হলে তোকে ধরে এক্কেবারে পোঁটলা-পেটা করে দেব।"

শেয়াল বলল, "হুজুর, এরা সব পাগল আর আহাম্মক, এদের সাক্ষীর কোনো মূল্য নেই।"

শুনে কুমির রেগে ল্যাজ আছড়িয়ে বলল, "কে বলল মূল্য নেই? দস্তুর মতো চার আনা পয়সা খরচ করে সাক্ষী দেওয়ানো হচ্ছে।" বলেই সে তক্ষুনি ঠক্‌ঠক্ করে ষোলোটা পয়সা গুণে হিজি বিজ্ বিজের হাতে দিয়ে দিল।

অমনি কে যেন ওপর থেকে বলে উঠল, "১নং সাক্ষী, নগদ হিসাব, মূল্য চার আনা।" চেয়ে দেখলাম কাক্কেশ্বর বসে-বসে হিসেব লিখছে।

শেয়াল আবার জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এ বিষয়ে আর কিছু জানো কি না?"

হিজি বিজ্ বিজ্ খানিক ভেবে বলল, "শেয়ালের বিষয়ে একটা গান আছে, সেইটা জানি।"

শেয়াল বলল, "কি গান শুনি।"

হিজি বিজ্ বিজ্ সুর করে বলতে লাগল, "আয়, আয়, আয়, শেয়াল বেগুন খায়, তারা তেল আর নুন কোথায় পায় —"

বলতেই শেয়াল ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল, "থাক্-থাক্, সে অন্য শেয়ালের কথা, তোমার সাক্ষী দেওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে।"

এদিকে হয়েছে কি, সাক্ষীরা পয়সা পাচ্ছে দেখে সাক্ষী দেবার জন্য ভয়ানক হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে। সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করছে, এমন সময় হঠাৎ দেখি কাক্কেশ্বর ঝুপ্ করে গাছ থেকে নেমে এসে সাক্ষীর জায়গায় বসে সাক্ষী দিতে আরম্ভ করেছে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে বলতে আরম্ভ করল, "শ্রীশ্রীভূশণ্ডিকাগায় নমঃ। শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে, ৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি। আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী খুচরা পাইকারী সকলপ্রকার গণনার কার্য—"

শেয়াল বলল, "বাজে কথা বোলো না, যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। কি নাম তোমার?"

কাক বলল, "কি আপদ! তাই তো বলছিলাম - শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে।"

শেয়াল বলল, "নিবাস কোথায়?"

কাক বলল, "বললাম যে কাগেয়াপটি।"

শেয়াল বলল, "সে এখান থেকে কতদূর?"

কাক বলল, "তা বলা ভারি শক্ত। ঘণ্টা হিসেবে চার আনা, মাইল হিসাবে দশ পয়সা, নগদ দিলে দুই পয়সা কম। যোগ করলে দশ আনা, বিয়োগ করলে তিন আনা, ভাগ করলে সাত পয়সা, গুণ করলে একুশ টাকা।"

শেয়াল বলল, "আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাড়ি যাবার পথটা চেন তো?"

কাক বলল, "তা আর চিনি নে? এই তো সামনেই সোজা পথ দেখা যাচ্ছে।"

শেয়াল বলল, "এ-পথ কতদূর গিয়েছে?"

কাক বলল, "পথ আবার যাবে কোথায়? যেখানকার পথ সেখানেই আছে। পথ কি আবার এদিক-ওদিক চড়ে বেড়ায়? না, দার্জিলিঙে হাওয়া খেতে যায়?"

শেয়াল বলল, "তুমি ভারি বেয়াদব হে! বলি, সাক্ষী দিতে যে এয়েছ, মোকদ্দমার কথা কি জানো?"

কাক বলল, "খুব যা হোক! এতক্ষণ বসে-বসে হিসেব করল কে? যা কিছু জানতে চাও আমার কাছে পাবে। এই তো, প্রথমেই, মান কাকে বলে? মান মানে কচুরি। কচুরি চারপ্রকার— হিঙের কচুরি, খাস্তা কচুরি, নিমকি আর জিবেগজা। খেলে কি হয়? খেলে শেয়ালদের গলা কুট্‌কুট্‌ করে, কিন্তু কাগেদের করে না। তার পর একজন সাক্ষী ছিল, নগদ মূল্য চার আনা, সে আসামে থাকত,

তার কানের চামড়া নীল হয়ে গেল— তাকে বলে কালাজ্বর। তারপর একজন লোক ছিল সে সকলের নামকরণ করত — শেয়ালকে বলত তেলচোর, কুমিরকে বলত অষ্টাবক্র, প্যাঁচাকে বলত বিভীষণ—" বলতেই বিচার সভায় একটা ভয়ানক গোলমাল বেধে গেল। কুমির হঠাৎ খেপে গিয়ে টপ্ করে কোলাব্যাঙকে খেয়ে ফেলল, তাই দেখে ছুঁচোটা কিচ্‌কিচ্ কিচ্ কিচ্ করে ভয়ানক চ্যাঁচাতে লাগল, শেয়াল একটা ছাতা দিয়ে হুস্ হুস্ করে কাক্কেশ্বরকে তাড়াতে লাগল।

প্যাঁচা গম্ভীর হয়ে বলল, "সবাই চুপ কর, আমি মোকদ্দমার রায় দেব।" এই বলেই কানে-কলম-দেওয়া খরগোশকে হুকুম করল, "যা বলছি লিখে নাও: মানহানির মোকদ্দমা, চব্বিশ নম্বর। ফরিয়াদী— সজারু। অসামী— দাঁড়াও। আসামী কই?" তখন সবাই বলল, "ঐ যা! আসামী তো কেউ নেই।" তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে-ভালিয়ে নেড়াকে আসামী দাঁড় করানো হল। নেড়াটা বোকা, সে ভাবল আসামীরাও বুঝি পয়সা পাবে, তাই সে আপত্তি করল না।

হুকুম হল— নেড়ার তিনমাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি। আমি সবে ভাবছি এরকম অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা উচিত, এমন সময় ছাগলটা হঠাৎ "ব্যা-করণ শিং" বলে পিছন থেকে তেড়ে এসে আমায় এক ঢুঁ মারল, তার পরেই আমার কান কামড়ে দিল। অমনি চারদিকে কিরকম সব ঘুলিয়ে যেতে লাগল, ছাগলটার মুখটা ক্রমে বদলিয়ে শেষটায় ঠিক মেজোমামার মতো হয়ে গেল। তখন ঠাওর করে দেখলাম, মেজোমামা আমার কান ধরে বলছেন, "ব্যাকরণ শিখবার নাম করে বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমোনো হচ্ছে?"

আমি তো অবাক! প্রথমে ভাবলাম বুঝি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু, তোমরা বললে বিশ্বাস করবে না, আমার রুমালটা খুঁজতে গিয়ে দেখি কোথাও রুমাল নেই, আর একটা বেড়াল বেড়ার উপর বসে বসে গোঁফে তা দিচ্ছিল, হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়েই খচ্‌মচ্ করে নেমে পালিয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময় বাগানের পিছন থেকে একটা ছাগল ব্যা করে ডেকে উঠল।

আমি বড়োমামার কাছে এ-সব কথা বলেছিলাম, কিন্তু বড়োমামা বললেন, "যা, যা, কতগুলো বাজে স্বপ্ন দেখে তাই নিয়ে গল্প করতে এসেছে।" মানুষের বয়স হলে এমন হোঁতকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তোমাদের কিনা এখনো বেশি বয়স হয় নি, তাই তোমাদের কাছে ভরসা করে এ-সব কথা বললাম।